www.MurchOna.com

গেলেম নতুন দেশে

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

প্রথমে মেলবোর্ন, পরে সিডনি। দু'জায়গায় পর পর দু'শনিবার সাহিত্যসভা আর তার আগে পরে পনেরো ষোলো দিন চুটিয়ে বেড়ানো। প্রবাসী বাঙালিদের কাছ থেকে এমন একটা চমৎকার নেমন্তন্ন পেয়ে পাড়ি জমিয়েছিলাম অস্ট্রেলিয়ায়। সঙ্গে ভাই কাম ভ্রমণগার্জেন কুণাল। নভেম্বরের গোড়ায় দক্ষিণ গোলার্ধের ওই মহাদেশে তখন বসন্তকাল। সিডনিতে রাস্তায় রাস্তায় বেগনি রং জাকারান্ডা ফুল। মেলবোর্নে লাল টুকটুক বট্‌লব্রাশ।

মেলবোর্নে তরুণ অনসূয়া, যাদের বাড়িতে আমরা উঠেছিলাম, আমন্ত্রণ জানানোর সময়েই মজা করে বলেছিল, অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছেই কিন্তু এয়ারপোর্টের বাইরে ক্যাঙারু খুঁজবেন না। অনেক সাহেব যেমন ভারতে এসেই রাস্তায় বাঘ হাতি আর সাপ আশা করে, সে রকম আর কী! তবে, হ্যাঁ, মা ষষ্ঠীর, থুড়ি, মা মেরির কৃপায় অস্ট্রেলিয়ায় এখন প্রচুর ক্যাঙারু, যথাস্থানে, যথাসময়ে তাদের দর্শন মিলবে জঙ্গলের দিকে। ঘুম কাতুরে খুদে ভাল্লুক কোয়ালার দেখা মেলাও অসম্ভব নয়। কিংবা শেয়াল সদৃশ ডিংগো-র।

তা, পাক্কা সাড়ে তিন ঘণ্টা সিঙ্গাপুর এয়ারপোর্টে বসে থেকে, দু'দফায় মোট এগারো ঘণ্টা আকাশে উড়ে যখন সন্ধেরাতে মেলবোর্ন পৌঁছলাম, ক্যাঙারু, কোয়ালা, ডিংগো মন থেকে বেবাক উধাও। হাক্লান্ত দশায় তখন একটাই চিন্তা। সুটকেস, হ্যান্ড লাগেজ, ভ্যানিটি ব্যাগ, সর্বত্র রয়েছে আমার জাবর কাটার মালমশলা। সুপুরি, মউরি আর লেবু বিটনুনে মজানো মুখরোচক জোয়ান। বি মানবন্দরের স্নিফার ডগ গন্ধ শুঁকেই না ধরে ফেলে! সিগারেট জর্দা চলতে পারে, কিন্তু কোনও ধর নের শস্যদানা, ফলমূল, খাবারদাবার নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অস্ট্রেলিয়ায় বেজায় কড়াকড়ি। যথাযথ প্যাকেট করা মাল না হলে সঙ্গে সঙ্গে তা চালান হয়ে যাবে কোয়ারেনটাইনে। বহু বছর আগে কে এক মিসেস প্যাটারসন নাকি ইংল্যান্ড থেকে কী এক সর্বনেশে বীজ নিয়ে গিয়েছিলেন, তা থেকে ঝোপঝাড় গজিয়ে নাকি নানান রোগ ছড়িয়েছে ও দেশে। অস্ট্রেলিয়ানরা ওই জংলা গাছের নাম দিয়েছে মিসেস প্যাটারসনের অভিশাপ। ওই সব কারণেই হয়তো এত সাবধানতা। নাকি বিচ্ছিন্ন ওই মহাদেশে নানান বিরল প্রজাতির প্রাণী আর উদ্ভিদ আছে, তাদের স্বার্থেই...।

www.MurchOna.com

যাক গে যাক। কপাল ভাল, এয়ারপোর্টে সে দিন নো গন্ধবিশারদ কুকুর। আমার খোলা সুপুরি জোয়ানের অনারেই বোধহয় সি-এল নিয়েছিল। নিশ্চিন্ত মুখে অভিবাসনের গণ্ডি পেরিয়ে দেখি, তরুণ অনসূয়া তো বটেই, আমাকে স্বাগত জানাতে হাজির আছেন বাংলা সাহিত্য সংসদের এক ঝাঁক হাসিমুখ।

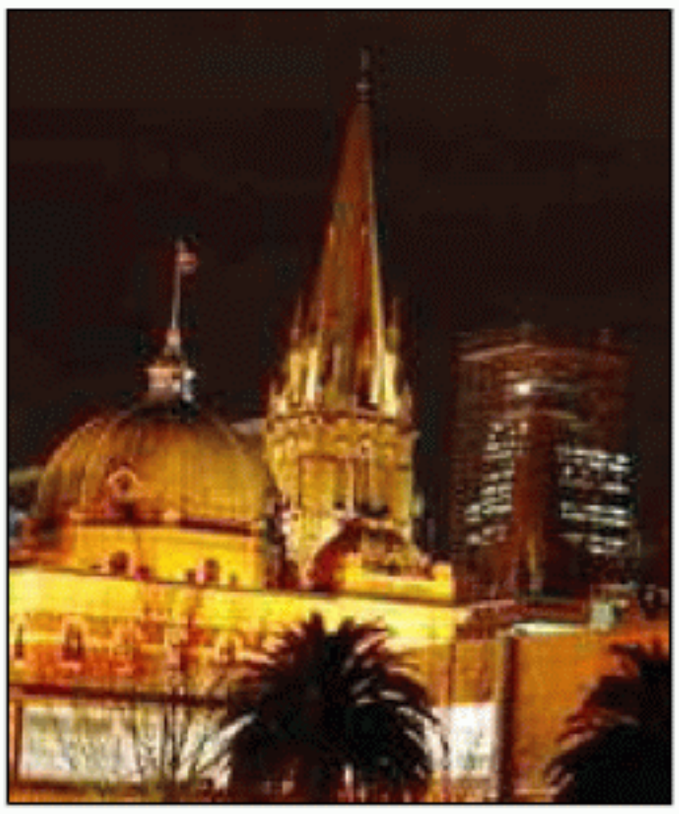

মেলবোর্নের বাংলা সাহিত্য সংসদের গড়নটা একটু অন্য রকম। দশটি মাত্র বাঙালি পরিবার মিলে তৈরি করেছে এই সংসদ। পাঁচটি এ-পার বাংলার, পাঁচটি ও-পার বাংলার। আছেন প্রতীশ টুকু, তরুণ অনসূয়া, রিংকু রঞ্জন, নারায়ণ অদিতি, মঞ্জরী অরিন্দম। আছেন নাহিদ মুনির, লুলু লুৎফর, তুহিন শিল্পী, খাদিজা বীথি নিখিল, আর হোমায়েত হোসেন। অবশ্য এঁদের উৎসাহ জোগাচ্ছেন আরও বেশ কিছু বাঙালি। সংসদের সদস্যরা বাংলা সাহিত্য নিয়ে আলোচনায় বসেন নিয়মিত, নিজেদের পত্রিকায় গল্প-কবিতা লেখেন, অভিনয় করেন বাংলা নাটক, আসর জমান বাংলা গানের । ছেলেমেয়ে, নাতি নাতনির মধ্যেও বাংলা ভাষাকে টিঁকিয়ে রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা চালাচ্ছেন এঁরা। স্থানীয় লাইব্রেরিতে পর্যন্ত বাংলা বই রাখিয়েছেন। আমাদের দেশে বাংলা ভাষার কদর কমছে দিন দিন, অথচ, দূর প্রবাসে শত ব্যস্ততার মাঝেও মাতৃভাষাকে আঁকড়ে থাকার এই প্রয়াস, সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চায় দুই বাংলার কাঁধে কাঁধ মেলানো এও তো এক মধুর সত্যি।

বাংলা সাহিত্য সংসদ অতিথিপরায়ণতাতেও কম যায় না। এয়ারপোর্ট থেকে শুরু হয়েছিল আদর আপ্যায়ন, তার পর তো প্রায় রোজই রাতে কারও বাড়িতে ভোজ। দল বেঁধে। আর, দিনের বেলা তো বেরিয়ে পড়ছি এ দিক, ও দিক। মাত্র সাত দিনে প্রায় চষে ফেললাম মেলবোর্ন আর তার আশপাশ।

তরুণ অনসূয়ার বাড়ি গ্লেন ওয়েভারলিতে। অঞ্চলটার নাম মনাশ। সেখান থেকে শহরের কেন্দ্রস্থলে আসতে গেলে ইয়ারা নদীকে ফুঁড়ে যাওয়া একটা টানেল পেরোতে হয়। টানেলটা বেশ লম্বা, কিন্তু নদীটা বড্ড সরু। এই নদীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল মেলবোর্ন শহর। ইয়ারা ভ্যালিতেই ফলে দুনিয়ার অন্যতম সেরা আঙুর, যা থেকে তৈরি হয় পৃথিবী বিখ্যাত অস্ট্রেলিয়ান ওয়াইন। শীর্ণকায়া ওই স্রোতস্বিনীর মহিমা বোঝা অবশ্য আমাদের মতো নদীনালার দেশের মানুষদের পক্ষে একটু কঠিনই।

তা যাই হোক, ইয়ারার দু'পাড়ে ছড়ানো মেলবোর্ন শহরটা কিন্তু সত্যিই ভারী সুন্দর। মসৃণ রাস্তাঘাট, ছবির মতো বাড়িঘর, অফিসপাড়ায় আকাশ ছোঁয়া অট্টালিকার সারি। কোথাও এতটুকু ধুলোময়লা নেই, সার বেঁধে প্রায় নিঃশব্দে ছুটছে সুশৃঙ্খল গাড়িঘোড়া। নজরে পড়ার সুবিধের জন্য সাইকেল আরোহীদের গায়ে বাধ্যতামূলক চকচকে পোশাক, মাথায় হেলমেট, বেপরোয়া ভাবে যত্রতত্র রাস্তা পার হচ্ছে না কোনও পথচারী। নজরদারির জন্য পথেঘাটে ঘাপটি মেরে আছে পুলিশের ক্যামেরা। সুদৃশ্য ট্রাকে মাল যাচ্ছে ঢাকাঢুকি দিয়ে, সভ্যভব্য হয়ে, বর্জ্য ধোঁওয়া কাউকে না জ্বালিয়ে উঠে যাচ্ছে ঊর্ধ্বপানে, হাঁপ জিরনোর জন্য ফুটপাথে মাঝেমাঝেই পরিচ্ছন্ন বেঞ্চি, ইট

www.MurchOna.com

কাঠ সিমেন্ট ইস্পাতের অরণ্যে সবুজের সমারোহ... মানসচক্ষে কলকাতাকে যেমনটা দেখতে চাই, ঠিক সে রকমই। আমাদের এই পোড়া শহর থেকে প্রায়ই ট্রাম উঠিয়ে দেওয়ার কথা চলে, অথচ, ে মলবোর্নের ব্যস্ত এলাকায় ট্রামের কী রমরমা! ঝকঝকে বাহারি ট্রাম সদর্পে চক্কর খাচ্ছে অফিসপাড়ায়। সাদার্ন ওশানের একটা ফালি (ব্যাস স্ট্রেট) খাঁড়ির মতো ঢুকে এসেছে শহরের দক্ষিণ প্রান্তে। ঝাঁক ঝাঁক সিগালে ভরা সমুদ্রতটটিও ভারী মনোরম। ওই সমুদ্রের ধারেই নাকি শেন ওয়ার্ন থাকেন। বাড়িটা কোথায়, খোঁজা হল না।

সমুদ্রের দিকে যাওয়ার পথে চোখে পড়েছিল বেশ কিছু পুরনো ধাঁচের কটেজ। ওগুলো নাকি অস্ট্রেলিয়ায় বাস করতে আসা ব্রিটিশদের গোড়ার দিকের ঘরবাড়ি। এমন কিছু মান্ধাতার আমলের নয় অবশ্য। অস্ট্রেলিয়ায় সাদা চামড়ার মানুষদের ইতিহাসই বা ক'দিনের! সবে তো দুশো পেরিয়েছে। মেলবোর্নের বয়স একশো ষাট সত্তর। সিডনিতে যখন বন্দিদের নিয়ে ইংরেজদের ল্যাজেগোবরে দশা, তখনই লেফটেন্যান্ট জন মারে এসে ঘাঁটি গাড়লেন মেলবোর্ন থেকে শ'খানেক মাইল দূরে, পোর্ট ফিলিপে। সেখানকার আবহাওয়া ছিল ভয়ঙ্কর খারাপ। অ্যান্টার্কটিকা থেকে ধেয়ে আসা কনকনে বাতাস আর উল্টোপাল্টা ঝড়ের দাপটে টেঁকাই ছিল দায়। আরও বছর তিরিশ পর জন ব্যাটম্যান নামের এক পশুপালক জাহাজ নিয়ে প্রথম মেলবোর্নে এসে পৌঁছন। তখন ওখানে থাকত ওয়াইওরাং নামের এক আদিবাসী সম্প্রদায়। সাহেবদের যা রীতি, টুপিটাপা দিয়ে, স্রেফ কিছু জিনিসপত্রের বিনিময়ে আদিবাসীদের কাছ থেকে হাতিয়ে ফেলল দু'লক্ষ হেক্টর জমি। পত্তন হল মেলবোর্নের। তারও বছর দশেক পর ইয়ারা নদীর ধারে গড়ে ওঠে বসতি। বাসিন্দা কিছু বন্দি, আর ভাগ্যের সন্ধানে দেশ থেকে চলে আসা কিছু ব্রিটিশ। এর পর ১৮৫১ সালে হঠাৎই ে মলবোর্নের উত্তর দিকে সোনার খনির সন্ধান পাওয়া গেল। ব্যস, দিকে দিকে রটে গেল বারতা। দেশ বিদেশ থেকে সোনার লোভে ছুটে আসতে লাগল মানুষ, প্রায় ঘুমন্ত মেলবোর্ন সেই হট্টগোলে বনে গেল দিব্যি ঝলমলে মহানগর।

সে নাকি এক আজব সময় গেছে মেলবোর্নে। চতুর্দিকে তখন থিকথিক করছে সদ্য সোনা তুলে আনা সৌভাগ্যবানের দল। তারা শ্যাম্পেন দিয়ে বাথটব ভরাত, পাইপ ধরাত ব্যাঙ্কনোট জ্বালিয়ে, আর রেসের মাঠে ওড়াত লাখ লাখ পাউন্ড। তখন থেকেই শুরু হয় পৃথিবীর সব চেয়ে বিখ্যাত ঘোড়দৌড়। মেলবোর্ন কাপ।

বরাতজোরে ওই কাপের সময়েই গিয়ে পড়েছিলাম মেলবোর্নে। চার দিকে কী উৎসবের ধুম, বাপ্‌স! সাজগোজের নতুন নতুন ফ্যাশনে ছেয়ে গেছে শহরের মল, বিচিত্র টুপি পরে ঘুরছে মেয়েরা। মেলবোর্ন কাপের দিন তো জুড়িগাড়ি হাঁকিয়ে জমকালো শোভাযাত্রা বেরোল রাজপথে। একটা ঘোড়দৌড়ের জন্য মেলবোর্ন সহ গোটা ভিক্টোরিয়া স্টেটে অফিসকাছারি, স্কুল কলেজ সব বন্ধ। আস্ত একটা মহাদেশ কাজকর্ম ফেলে দুপুর দুটো থেকে তিনটে চোখ রেখেছে টিভির পর্দায়, ভাবা যায়? কার না ঘোড়া দৌড়য় এই রেসে! ইংল্যান্ডের রানি, সৌদি আরবের রাজা, আমেরিকার ধনকুবের...! এ বার অবশ্য কাপ জিতল এক জাপানির ঘোড়া। ডেল্টা ব্লুজ। বাঙালিদের দেখি সকলেরই মাথায় হাত। অফিসে অল্পস্বল্প ডলার লাগিয়েছিল যে! অন্য ঘোড়ার পিছনে।

আবার আসি সোনার গল্পে। প্রথম যেখানে সোনা পাওয়া গিয়েছিল, সেই ব্যালারাটে আমাদের নিয়ে গিয়েছিলেন মুনিরভাই আর হেমায়েতভাই। এখন ব্যালারাট এক আধুনিক শহর। তবে, মূল খনির জায়গাটায় সযত্নে বানিয়ে রাখা আছে দেড়শো বছর আগেকার পরিবেশ। ভিক্টোরিয়ান

www.MurchOna.com

যুগের কাঠের বাড়ি, কাঠের পানশালা, আদ্যিকালের ব্যাঙ্ক, সেকেলে চেহারার দোকান, এবড়োখেবড়ো মাটির রাস্তা, অতীত দিনের পোশাকে সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে নারী পুরুষ সময়টাই যেন টাইম মেশিনে পিছিয়ে গেছে। একেবারেই কৃত্রিম, তবে আসল বলে ভ্রম হয়। মুগ্ধ হয়ে মাথায় লেসের ব্যান্ড জড়ানো, লম্বা গাউন এক নীলনয়নাকে রাজকুমারী বলে ডেকেও ফেললাম, সে মেয়ে তো হেসে খুন। সোনার কুচির আশায় বেলচায় খানিক বালি আর পাথরও তুললাম ঘোলা জলের স্রোত থেকে। অন্ধকার গর্তে নেমে দেখে এলাম পাথর খুঁড়ে সোনা পাওয়ার নিখুঁত লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো। চার্লি চ্যাপলিনের গোল্ড রাশের সেই অদ্ভুত জায়গায় পৌঁছেছি, ভাবতেই যে কী শিহরন তখন!

ফিলিপ আইল্যান্ডেও যাওয়া হল এক দিন। প্রতীশদা আর টুকুর সঙ্গে। সিলমাছ আর ফেয়ারি পেঙ্গুইন দেখতে। ভোর থেকে সে দিন মেলবোর্নে টিপটিপ বৃষ্টি। সঙ্গে গায়ে ছুঁচ ফোটানো ঠাণ্ডা বাতাস। কিন্তু, কী আশ্চর্য, বেলা একটু বাড়তেই ঘন মেঘে ছাওয়া আকাশ দিব্যি পরিষ্কার। দুপুরে তো রীতিমত কড়া রোদ্দুর। মেলবোর্নের নাকি এটাই মজা, একই দিনে চারটে ঋতুই দেখা যায় হঠাৎ হঠাৎ। দক্ষিণ মহাসাগর থেকে বাতাস এল তো ঠকঠক কাঁপো, উত্তরের মরুভূমি হাওয়া পাঠাল তো গরমে ভাজা ভাজা হও। এই রোদ, এই বৃষ্টি, এই গরম, তো এই ঠাণ্ডা এটাই নাকি টিপিকাল মেলবোর্ন ওয়েদার।

ফিলিপ আইল্যান্ডে অবশ্য ঠাণ্ডাই ঠাণ্ডা। হাড় কাঁপানো হুহু হাওয়া বইছে সর্ব ক্ষণ। তবে, এ ঠাণ্ডা নাকি কিছুই নয়, শীতকালে এলে নাকি রক্ত জমে যায়। শুনে বুঝলাম কেন ব্রিটিশরা পোর্ট ফিলিপ থেকে মেলবোর্নের দিকে পা বাড়িয়েছিল। সমুদ্রের ধারে সেখানে পালে পালে সিগাল। কলকাতার কাকের মতো হ্যাংলামি করে তারা, পারলে হাত থেকে খাবার ছিনিয়ে নেয়। তবে, দ্বীপের প্রান্তে, ব্যাস স্ট্রেটের ধার ধরে, সিলমাছ দেখতে চলেছি, দু'পাশে পাহাড়ের ঢাল ছেয়ে আছে রঙিন ঘাসফুল আর কলরব মুখর সিগালে, এ দৃশ্য চোখে লেগে থাকবে বহু দিন। আর ফেয়ারি পেঙ্গুইন? সে তো এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা। দ্বীপের আর এক প্রান্তে ওই সব খুদে খুদে উকিলবাবুদের বাস। কাকভোরে ঝাঁক বেঁধে সমুদ্রের অনেক ভেতরে চলে যায় তারা, ফেরে সেই সূর্য যখন ডুবুডুবু। মানে, আটটা, সোয়া আটটা। প্রথমে এক জন জল থেকে উঠে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিরীক্ষণ করে নেয় চার দিক, তার পর সিগনাল দিলে বাকিরা দলে দলে বেরিয়ে আসে সমুদ্র থেকে। অতঃপর দ্রুত পায়ে দুলে দুলে বাসায় প্রত্যাবর্তন। অফিস (সমুদ্র) ফেরত কর্তাকে আহ্বান জানাতে গিন্নি দাঁড়িয়ে আছেন গর্তের মুখে, কিংবা পেটে মাছ বোঝাই গিন্নিকে স্বাগত জানাতে কর্তা, দুষ্টুমি করে কোনও কোনও দুশ্চরিত্র টুকুস সেঁধিয়ে যাচ্ছে অন্যের সংসারে, কেউ বা আস্তানা খুঁজে না পেয়ে দিশেহারা, ডাকাডাকি হল্লাগুল্লা চলছে জোর এ দৃশ্যও কি ভোলা যায়!

ওঃহো, আর একটা গল্প তো বলাই হয়নি। ফিলিপ আইল্যান্ড যাওয়ার পথে হইহই করে একটা ওয়াইনারিতেও ঢুকেছিলাম সে দিন। মালিক এক বৃদ্ধ ইটালিয়ান। নাম জোয়ান্নি। তিনি সগর্বে জানালেন, মাফিয়াদের দেশ সিসিলি তাঁর আদি বাসভূমি। চল্লিশ বছর বয়স অবধি তিনি ছিলেন বাড়ি বানানোর পেশায়, সব ছেড়েছুড়ে এখন আঙুর ক্ষেত নিয়ে মেতেছেন। নিছক ব্যবসায়ী নন, ওয়াইন তৈরি তাঁর প্যাশন। বছরে হাজার পাঁচেক বোতল যদি বানান, তো নিজেরাই সেবন করেন

www.MurchOna.com

কম করে দু'হাজার বোতল। জোয়ান্নির শো-রুমের বাইরে দেখি এক লাউগাছ। শুনলাম, লাউডগার স্যুপ খান জোয়ান্নি, লাউডগা সেদ্ধ করে স্যান্ডুইচের পুর বানান। আর সাধের লাউ ভক্ষণ করেন কুচি কুচি করে কেটে, রসুন দিয়ে ভেজে। অভিনব ইটালিয়ান রেসিপিতে আমরা রীতিমত চমৎকৃত।

ইটালিয়ান খানা অবশ্য মেলবোর্নে উপভোগ করেছি তারিয়ে তারিয়ে। লাউডগার স্যান্ডুইচ নয়, অক্টোপাস স্কুইড অয়েস্টার আর কোয়েল পাখির নানান প্রিপারেশন। গ্রিল্ড বেবি অক্টোপাস। ব্রাসেত্তা। অয়েস্টার ফিলপ্যাট্রিক। কোয়েল আলাভার্দি দিয়ে। মেলবোর্নের লাইগন স্ট্রিটে সার সার শুধু ইটালিয়ান রেস্তোরাঁ, কাস্টমারদের তারা খাওয়ার জন্য ডাকাডাকি করে।

লাইগন স্ট্রিটে নৈশাহার সেরে রাতের আলো ঝলমল মেলবোর্নও দেখা হল এক দিন। ক্যাসিনোয় ঢুকে ভাগ্যপরীক্ষা করতে গিয়ে খোয়ালাম বেশ কয়েক ডলার। একটা চমৎকার রোদ-ঝরা দিনে তরুণ অনসূয়ার সঙ্গে চলে গেলাম গ্রেট ওশান ড্রাইভে। পাহাড় কেটে, সমুদ্রের গা ধরে, সে এক অনুপম রাস্তা। ইচ্ছে ছিল সেই অবধি যাব যেখানে সমুদ্রে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে এগারোখানা পাহাড়। নাকি বারোখানা? যিশুর বারো জন শিষ্যের মতো? কিন্তু সে দিন যে আবার জিলংয়ে র ানার বাড়িতে বার বি কিউয়ে নেমন্তন্ন, অতএব লর্নের সোনালি সৈকত থেকে ফিরতে হল আ মাদের। লর্ন যাওয়ার পথে সাহেব মেমদের বিয়েও দেখলাম একখানা। মনকাড়া নিসর্গের টানে চার্চ ছেড়ে গাঢ় নীল সমুদ্রের পাড়ে দাঁড়িয়ে, প্রাচীন বাতিঘরকে সাক্ষী রেখে, আংটি দেওয়া নেওয়া করছে বর বউ! আহাঃ, কী রোমান্টিক!

তা, খানাপিনা, দেখা, ঘোরা অনেক তো হল। ক্যাঙারুর দর্শন তো মিলল না এখনও! লর্ন থেকে ফেরার পথে তরুণ গাড়ি নিয়ে বনেবাদাড়ে ঘুরেছিল খানিক, ঝুপ করে যদি সামনে এসে পড়ে। ি মশন ফেল্‌ড। নো ক্যাঙারু। শুনে সাহিত্য সংসদের সদস্যদেরও কপালে ভাঁজ। মেলবোর্নের আশপাশে এত ক্যাঙারু, অথচ একটাও দেখানো যাবে না! এ তো প্রেস্টিজ কা সওয়াল। এ দিকে আমাদের মেলবোর্নের মেয়াদও ফুরিয়ে আসছে!

অগত্যা ছোট্ ছোট্ ছোট্। ড্যান্ডেনং পাহাড়। তরুণ অনসূয়ার সঙ্গে নারায়ণ অদিতিও বেরিয়ে পড়েছে ক্যাঙারু অভিযানে। তাদের তরুণী কন্যা মিমিও। অবশেষে মুখরক্ষা হল, সাক্ষাৎ মিলল বাবুদের। যেখান থেকে মেলবোর্নের জল সরবরাহ করা হয়, সেই কার্ডিনিয়া জলাধারের কাছে, পাহাড়ের ঢালে চরছিলেন তাঁরা। প্রথমে ঘাবড়ে চম্পট দিচ্ছিলেন, যেই না ফোটো সেশন শুরু হল, অমনি নট নড়নচড়ন। পোজ দিয়েই চলেছেন নানান ভঙ্গিমায়! টুপটাপ লাফ দেখাচ্ছেন! শেষে এ মন হল, হ্যাট হ্যাট করলেও তারা যায় না। অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় প্রাণী যে ছবি তোলাতে এত ভালবাসে, আমার জানা ছিল না।

সে দিন আর একটি পাওনা ছিল বরাতে। উপরি। খানিক দূরে শেরব্রুক ফরেস্টে ভারী সুন্দর পাখি দেখলাম রাশি রাশি। গাছ সাদা করে বসে থাকা হলদে ঝুঁটি কাকাতুয়া, ডানায় লাল নীল হলুদ সবুজ রং ছোপানো অপরূপ রোজেলা, রংবেরঙি পায়রা। এবং লাফিং কোকাবুরা। পৃথিবীর বৃহত্ত ম মাছরাঙা। শেষ বিকেলে এক ঝটকায় এতগুলো পাখি দেখতে পেয়ে খুশিতে তর হয়ে গেল

www.MurchOna.com

মনটা।

রাতে সে দিন বিদায় ভোজ রিংকু রঞ্জনদের বাড়ি। সঙ্গে গান, আবৃত্তি, বাঁশি, মাউথ অর্গানের জ
মজমাট আসর। বিদেশে বেড়ে ওঠা অল্পবয়সী মেয়েরাও কী চমৎকার শুদ্ধ উচ্চারণে, হারমোনিয়া
ম বাজিয়ে বাংলা গান গাইল। এরা যে দেশেই থাকুক, বাংলা ভাষাকে এরা মরতে দেবে না, এ আমি
ম বেশ জোরের সঙ্গে বলতে পারি। ডেরায় ফিরে গুছিয়ে নিলাম বাক্সপেঁটরা। কাল সকালেই আ
মাদের বেরিয়ে পড়ার কথা। সিডনির পথে।

www.MurchOna.com

গেলেম নতুন দেশে

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

সকাল সকালই বেরিয়ে পড়েছিলাম মেলবোর্ন থেকে। গাড়িতে। সারথি, প্রতীশদা। সঙ্গে তাঁর ঘরণী টুকু। প্রথমে কথা হয়েছিল মেলবোর্ন থেকে সিডনি প্লেনেই যাব, আমিই কাঁচিয়ে দিয়েছি প্ল্যানটা। দূর! হুস করে উড়ে গেলে দেশ দেখা যায় নাকি? যেতে হয় ধীরে, সুস্থে, চার পাশটা দেখতে দেখতে, অচেনা পৃথিবীটাকে চাখতে চাখতে। সে দিক দিয়ে আমার পছন্দ ছিল ট্রেন, তবে টুকুর তরফ থেকে গাড়িতে যাওয়ার প্রস্তাব পেয়ে মোটেই আপত্তি করিনি। যে ভাবে খুশি চলব, যেখানে ইচ্ছে থামব, রাত্তিরে থেকে যাব কোনও এক নাম- না- জানা শহরে — এর চেয়ে ভাল বন্দোবস্ত আর কী?

তবু, মনে একটা সঙ্কোচও ছিল। মেলবোর্ন থেকে সিডনির দূরত্ব প্রায় নশো কিলোমিটার। অস্ট্রেলিয়াকে বেড় দিয়ে থাকা প্রিন্সেস হাইওয়ে দিয়ে গেলে সময় লাগে প্রায় দশ ঘণ্টা। এতটা পথ প্রতীশদা গাড়ি চালিয়ে যাবেন, আবার পর দিনই ফেরা...! শুধু তা-ই নয়, হাইওয়ে ছেড়ে অন্য একটি সিনিক পথ দিয়ে আমাদের নিয়ে যাবেন প্রতীশদা। ঘুরপথে সময় বেশি লাগবে, তবে বেড়ানোর সুখটা নাকি হবে জব্বর। কিন্তু, তার জন্য বছর বাষট্টির মানুষটার ওপর বেশি ভার চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে না তো?

প্রতীশ ব্যানার্জি অবশ্য হতবাক করে দিয়েছেন। দু'দিনের দীর্ঘ যাত্রায় এক মুহূর্তের জন্যও তাঁকে ক্লান্ত দেখিনি। আমরা হয়তো খেয়েদেয়ে ঢুলছি, প্রতীশদা কিন্তু সর্বদা টানটান। যেন এক টগবগে তরুণ। উৎসাহী স্বরে পথের ধারাবিবরণী দিয়ে চলেছেন অবিরাম। কোথায় কখন বুশ ফায়ার হয়েছিল, অস্ট্রেলিয়ার কোথায় ব্রাউন কয়লা পাওয়া যায়, কোথায় বা সোনা। পঁয়তাল্লিশ বছর আগে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ায়, এত দিন প্রবাসে থেকেও প্রতীশদার বাংলায় কোনও সাহেবি টান নেই। পেশায় বৈজ্ঞানিক এই ভদ্রলোকটি ভারতীয় মার্গসঙ্গীতের একনিষ্ঠ ভক্ত। নিজে ভাল বাঁশি বাজাতে পারেন। সেতারও। গৃহকর্মেও তিনি বিশেষ দক্ষ। ওপেল কাটার আজব নেশা আছে, আবার ছবি তোলারও। এ ছাড়া, তিনি এখন মেলবোর্নের সব চেয়ে ব্যস্ত বাঙালি পুরুত। তরুণও অবশ্য পুরুতগিরি করছে আজকাল। মাউথ অরগ্যানে দক্ষ শিল্পী, খড়্গপুর আই আই টি-র ইঞ্জিনিয়ার তরুণ ভট্টাচার্য তো আমরা মেলবোর্নে থাকাকালীনই টুকুস করে একটা গৃহপ্রবেশের পুজো সেরে এল। বিদেশে থাকলে যে বাঙালিরা কত ভাবে বিকশিত হয়!

www.MurchOna.com

যাই হোক, আমাদের সিডনি-যাত্রাটা গোড়া থেকেই খুব জমে উঠেছিল। পাঁচ মিনিট পর পরই প্রতীশদার হাত ঘুরে যাচ্ছে পিছনে। টুকু, আমায় একটা লিচি দাও! টুকু, এক টুকরো কাঁচামিঠে আম দাও! লজেন্স কিংবা আম মুখে পুরেই নতুন উদ্যমে শুরু হচ্ছে ধারাভাষ্য। এই দেখুন, পাশ দিয়ে রেল-লাইন চলেছে। ওই দেখুন, ছোট্ট শহরেও একটা ওয়ার মেমোরিয়াল।

হ্যাঁ, ওয়ার মেমোরিয়াল একটা লক্ষ করার ব্যাপার বটে! অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ব্রিটিশদের তো এক ধরনের গাঁটছড়া বাঁধা আছে, তাই ব্রিটিশরা যেখানেই যুদ্ধ করতে যায়, অস্ট্রেলিয়ান সেনাও সেখানে যাবেই। এবং মরবে অনেকে। তাদের স্মৃতিতে ছোট বড় প্রতিটি শহরেই একটা করে স্মৃতিস্তম্ভ। ক্যানবেরার ওয়ার মেমোরিয়াল তো রীতিমত দ্রষ্টব্য বস্তু। যুদ্ধ ফেরত সৈনিকদের সংগঠনও আছে শহরে শহরে। রিটার্নড সোলজারস লিগ। আর এস এল। অস্ট্রেলিয়ায় এদের বেশ দাপট। পয়সাও। নানান রকম চ্যারিটি শো করে ডলার তোলে এরা, জুয়ার আসরও বসায় কোথাও কোথাও।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত এক অস্ট্রেলিয়ান সৈনিকের দাদার সঙ্গে আলাপ হল পথে। তিরাশি বছরের কিথ প্রতীশদা আর টুকুর পারিবারিক বন্ধু। থাকেন মেলবোর্ন থেকে বেশ কিছুটা দূরে, এক ছোট্ট ছিমছাম শহর। ব্যাচেলর মানুষটি এই বয়সেও যথেষ্ট কর্মঠ, বাগান আর সমাজসেবা করে দিন কাটান। চল্লিশের দশকে মারা যাওয়া ভাইয়ের স্মৃতি এখনও তাঁর মনে জ্বলজ্বল করছে। ওই বিচ্ছিন্ন মহাদেশে এ রকম আরও কত মানুষ যে সর্বনাশা যুদ্ধের দগদগে ঘা বয়ে বেড়াচ্ছেন বুকে!

তা, খেতে খেতে, থামতে থামতে, দেখতে দেখতে ভালই যাচ্ছিলাম আমরা। তাসমান সাগর থেকে স্থলভূমিতে ঢুকে আসা লেক এন্ট্র্যান্সের শোভায় মোহিত হয়ে, কান নদী পেরিয়ে, প্রিন্সেস হাইওয়ে ছেড়ে ঢুকে পড়লাম নৈসর্গিক রাস্তায়। দূরে দিগন্তে আবছা পাহাড়ের সারি, পথের দু'ধারে হয় ঘন জঙ্গল, নয় অনন্ত চারণভূমি। জনমনিষ্যিহীন প্রান্তরে শয়ে শয়ে ভেড়া কিংবা গরু চরে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ হঠাৎ এক একটা কটেজ, কী ভীষণ নিঃসঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে। এত ফাঁকা, এত নির্জন যে, মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে। হিংসেও হয় একটু একটু। আমাদের এইটুকু রাজ্যেই প্রায় আট ন'কোটি মানুষ, আর ভারতের প্রায় আড়াই গুণ অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের জনসংখ্যা মাত্র দু'কোটি— কেন যে এমন হয়! অবশ্য অস্ট্রেলিয়ার মধ্যিখানটা নেহাতই বন্ধ্যা। মরুভূমি। মানুষের বসতি তো শুধুমাত্র সমুদ্র উপকূল আর তার আশপাশে। লোক তো এখানে কম হবেই। তবু, বিকেলের দিকে যখন একের পর এক জনপদ পেরচ্ছি, তখন এক আজব অনুভূতি। কী সুন্দর ছবির মতো এক একটা শহর! নিয়ম মতো গির্জা, স্কুল, পেট্রল পাম্প, একটা ম্যাকডোনাল্ডস, কিংবা একটা কে এফ সি, কিংবা হাংরি জ্যাক, আলো-ঝলমল শপিং সেন্টার, সবই আছে, এমনকী কটেজের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মালিকের গাড়িটিও, কিন্তু কোথাও একটা লোক নেই। হুবহু রূপকথার ঘুমন্ত পুরী যেন!

এমন এক নির্জন দেশে রাস্তাতেও যে মানুষজনের দেখা পাওয়া যাবে না, এটা তো স্বাভাবিক। যায়ওনি। শুধু, মাঝেমাঝে উল্টো দিক থেকে ধেয়ে আসা এক-আধটা গাড়ি, কখনও বা সামনে এসে পড়া অতিকায় ট্রাক, কিংবা কোনও উদাসী মানুষের ক্যারাভ্যান, বলে দেয় আছে, আছে, লোক আছে।

যাত্রার আগে একটা আশঙ্কার কথা জানিয়েছিলেন প্রতীশদা। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাব, পথে বুশ

www.MurchOna.com

ফায়ার শুরু হলেই চিত্তির। এই বসন্ত আর গ্রীষ্মকাল নাকি বুশ ফায়ারের আদর্শ সময়। তার ওপর পৃথিবীর এই শুষ্কতম মহাদেশে বছর কয়েক ধরে খরা চলছে, দাবানলও তাই বেড়েছে খুব। তা, আগুনের মুখোমুখি না পড়লেও তার নমুনা দেখলাম স্বচক্ষে। মাইলের পর মাইল গামট্রি-র মিছিল পুড়ে কালো হয়ে আছে, প্রতীক্ষা করছে পরবর্তী দাবানলের।

এই সব জঙ্গল পেরিয়ে, ছোট ছোট পাহাড় টপকে, পটে আঁকা ছবির মতো মাঠঘাট অতিক্রম করে সন্ধের মুখে মুখে পৌঁছলাম কুমায়। স্নোয়ি মাউন্টেনের কোলে ছোট্ট শহর, ঝকঝকে ঠাণ্ডা। ে মাটেলে কম্বল মুড়ি দিয়ে রাতটুকু কাটিয়ে গাড়ি ফের ছুটল স্নোয়ি মাউন্টেনের আরও ভেতরে। এই স্নোয়ি মাউন্টেন নিয়ে অজস্র উপকথা আছে অস্ট্রেলিয়ায়। বিখ্যাত কবি ব্যান্জো প্যাটারসনের অনুপম ব্যালাড 'দা ম্যান ফ্রম স্নোয়ি রিভার' তো মানুষের মুখে মুখে ফেরে। অস্ট্রেলিয়ায় আসা প্রথম যুগের লড়াকু মানুষদের প্রতীক হিসেবে ওই চারণগাথার নায়ক অস্ট্রেলিয়ায় দারুণ জনপ্রিয়। ব্যান্জো প্যাটারসনের মূর্তিও আছে জল-টলটল নীল লেক জিন্ডাবাইনের পাড়ে। শুনলাম, লেকের জল নাকি শীতকালে জমে বরফ হয়ে যায়, তখন স্কিইং করতে চলে আসে বহু পর্যটক।

পাহাড় ঘেরা মনোহর হ্রদটিকে ছেড়ে এ বার গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জ বেয়ে সোজা ক্যানবেরা। শান্তশিষ্ট, সবুজ অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী। মেলবোর্নে ক্যাঙারু দেখার জন্য অত ছটফট করেছি, এ দিকে ক্যানবেরা যাওয়ার স ময়ে রাস্তায় মাঝে মাঝেই ক্যাঙারু। জ্যান্ত নয়, মরা। হঠাৎ গাড়ির সামনে এসে গেলে হেডলাইটের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যায় বেচারাদের, বেঘোরে প্রাণ হারায়। যাই হোক, আমার ক্যাঙারু দর্শন বুঝি পরিপূর্ণ হল ক্যানবেরার রেস্তোরাঁয়। ক্যাঙারু পাই খেতে খেতে। মাঝে ক্যাঙারু ভক্ষণ নিষিদ্ধ ছিল, এখন জীবটি সংখ্যায় বৃদ্ধি পাওয়ায় বারণ-টারন আর নেই।

মন্দ নয় মাংসটা, দিব্যি সুস্বাদু। অনেকটা হরিণের মাংসের মতো। ক্যানবেরায় অন্য একটা অস্ট্রেলিয়াকেও দেখতে পেলাম আচমকা। পুরনো পার্লামেন্ট ভবনের সামনে তাঁবু খাটিয়ে বসে আছেন আদিম জনগোষ্ঠীর কিছু মানুষ। বিদেশিরা তাঁদের মাটি কেড়ে নিয়েছে, তারই প্রতিবাদে ১৯৭২ সাল থেকে টানা ধর্না চালাচ্ছেন। নিজেরাই নিজেদের তাঁবুর নাম দিয়েছেন অ্যাবরিজিন'জ পার্লামেন্ট। দুই কৃষ্ণকায় মহিলা ছিলেন তাঁবুতে, কথাবার্তা বলে বুঝলাম অস্ট্রেলিয়ানদের বিরুদ্ধে তাঁদের বিস্তর অভিযোগ। লেখাপড়া শেখানোর নাম করে সাহেবরা তাঁদের কোল থেকে ছেলেমেয়ে ছিনিয়ে নিয়েছে, ফলে একটা আস্ত প্রজন্মই নাকি বাপ-মা, পরিবার, পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে পুরোপুরি। এটা নাকি সুপরিকল্পিত শিশুহত্যা! ভূমিপুত্রদের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দেওয়ার এক ঘৃণ্য চক্রান্ত।

অস্ট্রেলীয় আদিবাসীদের বেশ কিছু শিল্পকর্মের নমুনা দেখে এসেছি মেলবোর্নে। ব্যুমেরাংয়ের গায়ে, আরও নানান টুকিটাকি সামগ্রীতে। শুনেছি ডিরিজিডুর মোহময় সুর। মোটা লম্বা বাঁশের চোঙে ফুঁ দিয়ে অমন সুর বার করা সহজ কথা নয়। আদিবাসীদের দাবি মিটবে কি না জানি না, তবে, ওই সব চিত্রকলা আর সুরকে বাঁচিয়ে রাখার কিন্তু একটা আলাদা মূল্য আছে। নয় কি?

ক্যানবেরা ছেড়ে বেরতে বেরতে বিকেল প্রায় পাঁচটা বাজল। এ বার হিউম হাইওয়ে ধরে সোজা সিডনি। নোঙর ফেলব সিডনির শ্রীমন্ত মুখার্জির বাড়িতে। তা, প্রতীশদা খালি শ্রীমন্তর ঠিকানা জানেন, বাড়ি চেনেন না। তবে, সমস্যা হল না। গাড়িতে লাগানো জি-পি-এস (গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম) নিখুঁত ভাবে পৌঁছে দিল শ্রীমন্তর দরজায়। কাজের দিনের রাত দশটাতেও শ্রীমন্তর বাড়ি তখন বাঙালি মুখে টইটম্বুর। মেলবোর্নের বাঙালিদের মতো এঁরাও দিব্যি সাহিত্য-অনুরাগী। এস এম জি আয়োজিত সাহিত্যসন্ধ্যায় এঁরাই শ্রীমন্তর বিশেষ বল-ভরসা। অবশ্য, তার সঙ্গে শ্রীমন্তর বউও আছে। মিষ্টি।

www.MurchOna.com

মেলবোর্নেই টের পেয়েছিলাম, সিডনি আর মেলবোর্নে একটা সূক্ষ্ম রেষারেষি আছে। সিডনিতে এসে ব্যাপারটা বেশ খোলামেলা হয়ে গেল। সিডনি বলে সিডনিই সেরা, মেলবোর্ন বলে ে মলবোর্ন। এই টানাপোড়েনের জন্যই কি মেলবোর্ন সিডনি ছেড়ে ক্যানবেরা অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী হয়েছে?

সত্যি কথা বলতে কী, সিডনি আর মেলবোর্নের চেহারায় একটা পার্থক্য কিন্তু আছেই। ে মলবোর্নের আছে একটা ধ্রুপদী আভিজাত্য, তুলনায় সিডনি অনেক বেশি আধুনিক, অনেক বেশি কসমোপলিটান। আয়তনেও সিডনি বেশ বড়। ভারেও। হবে না-ই বা কেন, সিডনিই তো অস্ট্রেলিয়ায় ব্রিটিশদের আদি শহর। ১৭৭০ সালে এই শহরেই জাহাজ ভিড়িয়েছিলেন ক্যাপ্টেন জেমস কুক। আর, তার বছর কুড়ি পর থেকে নির্বাসিত বন্দিদের পাঠানো শুরু হয় এই মহাদেশে। অর্থাৎ, মেলবোর্ন তৈরি হওয়ার বছর চল্লিশ আগে। সিডনিতে গাড়িঘোড়া, মানুষজন, ভিড়ভাট্টা সবই একটু বেশি বেশি। সিডনি হারবার অঞ্চলটা তো মানুষে মানুষে গমগম করে। কোন দেশের লোক যে এসে আস্তানা গাড়েনি সিডনিতে! গ্রিট, ইটালিয়ান, লেবানিজ, কোরিয়ান, চাইনিজ তো ে মলবোর্নেও দেখেছি, কিন্তু সিডনিতে এঁদের সংখ্যা অনেক বেশি। চিনারা তো প্রায় প্রতি দিনই বাড়ছে। ভিয়েতনামি, তাই, ইন্দোনেশিয়ান, মালয়েশিয়ানও কম নেই। আছে পূর্ব ইউরোপের অনেক মানুষও। শ্রীমন্তদের বাড়ির পিছনেই তো একখানা রুমানিয়ান অর্থোডক্স চার্চ। কালো মানুষরা সিডনিতে একটা আস্ত ব্ল্যাক টাউনই বানিয়ে ফেলেছে।

আর বাঙালি? মেলবোর্নে শ'তিনেক এ-পার বাংলার পরিবার, তো শ'পাঁচেক ও-পার বাংলার। সিডনিতে সংখ্যাটা প্রায় দ্বিগুণ। আধ ডজন দুর্গাপুজো হয় সিডনিতে, রেডিয়োয় বেশ কয়েকটা বাংলা চ্যানেল চলে, নিয়মিত বাংলা পত্রিকা বেরোয় কয়েকখানা, আছে বাংলা টিভি চ্যানেলও। অর্থাৎ, বাংলাভাষার স্বাস্থ্য সিডনিতে খারাপ নয়। অনেকটাই অবশ্য ও-পার বাংলার দৌলতে। তবে, অনুষ্ঠান টনুষ্ঠানে মেলবোর্নের মতোই গঙ্গা-পদ্মা হাত ধরাধরি করে আছে। সাহিত্যসন্ধ্যার দিন বাংলাদেশের ডালিয়া চৌধুরি, বনি আমেদ, জিয়া আহমেদরা নিষ্ঠা ভরে কী পরিশ্রমটাই কর লেন! প্রত্যয় অর্পিতা, অঞ্জলি গোরা, আশিস শম্পা, দীপেন স্মরণি, বাবলুবাবুদের পাশাপাশি। নাটকে অভিনয় করল শর্মিলার সঙ্গে মানিজে আবেদিন। বেশ লাগে দেখতে।

সিডনির কিছু স্মৃতি বুঝি কোনও দিনই মন থেকে মোছা যাবে না। এই শহরেই প্রশান্ত মহাসাগরের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। মিষ্টি আ মাদের বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছিল কায়ামায়, পথে পড়ল বুলাই লুক আউট। অনেকটা উঁচু থেকে প্রশান্ত মহাসাগরকে দেখে বুকটা শির শির করে উঠল। সেই একই নীল জল, ঢেউগুলোও পুরীর বঙ্গোপসাগরের মতোই, তবু যেন কেমন অন্য রকম। পৃথিবীর মোট স্থলভূমিকে যে মহাসমুদ্রটা ঢেকে দিতে পারে, যার অতল

গহ্বরে ডুবে যাবে মাউন্ট এভারেস্ট, ঝড় উঠলে যার ঢেউ তিন তলা ছাপিয়ে যায়, তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে গা ছমছম না করে পারে? পাশেই গাছে কাকাতুয়া, মাটিতে অস্ট্রেলিয়ান সাদা-কালো কাক ম্যাগপাই... অন্য দিন হলে জুলজুল চোখে দেখতাম তাদের, সে দিন যেন নজরেই পড়ল না।

কায়ামা পৌঁছেও ঘোরটা লেগে ছিল চোখে। সেখানে আর এক ভেলকি। মহাসাগরের ঢেউয়ের ধাক্কা পাথরে তৈরি করেছে গর্ত। ব্লো-হোল। সমুদ্রের জল ব্লো হোলে ঢুকে বসনতুবড়ির মতো নেচে উঠছে। ব্লো-হোল ফিলিপ আইল্যান্ডেও দেখেছি, তবে, ভাঁটা চলছিল বলে জলের খেলাটা দেখা হয়নি। গাড়ির স্টিয়ারিংয়ে বসে হঠাৎ হঠাৎ বেহিসেবি স্পিডে চড়ে যাওয়া সাদা মনের মেয়ে মিষ্টি খুব সুন্দর একটা দৃশ্য দেখাল আমাদের। অস্ট্রেলিয়ার স্পেশাল ডিশ ফিশ অ্যান্ড চিপ্‌স আর এক বার খাওয়া হল কায়ামায়। ফিলিপ আইল্যান্ডের মাছটা ছিল হোয়াইটিং, কায়ামায় বারামুন্ডি। তপসে আর ভেটকির জাতভাই দু'জন।

www.MurchOna.com

এর পর আরও কয়েক বার মোলাকাত হয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরের সঙ্গে। ম্যানলি বিচে, বন্ডাই বিচে...। তবে, রথীন মুখোপাধ্যায় আর বিবি মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে শহরের উত্তর প্রান্তে নর্থ হেডে গিয়ে মহাসমুদ্রটাকে দেখা একটা রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা। অনেকটা উঁচু খাড়া পাহাড়, তার পায়ে আছাড় খাচ্ছে ঢেউ, ফেনায় ফেনায় অপূর্ব আলপনা আঁকা হয়ে যাচ্ছে জলতলে... সে এক অপার্থিব ছবি। ক্ষ্যাপা লোকরা কি ওই সৌন্দর্যের টানেই গাড়িসুদ্ধ ঝাঁপ মারত সমুদ্রে? পাহাড়ের ওপর ভাগটা তাই অত মজবুত করে ঘিরে দেওয়া হয়েছে?

সমুদ্রের দিকে গিয়েছিলাম নদীপথেও। মেডো ব্যাঙ্ক থেকে সুদৃশ্য লঞ্চে চেপে, পারামাট্টা নদী বেয়ে সোজা মোহনায়। সিডনি হারবার। লঞ্চ যত এগোচ্ছে, কাছে আসছে সিডনির স্কাইলাইন, বিখ্যাত সিডনি হারবার ব্রিজ, অত্যাশ্চর্য সিডনি অপেরা... ফুরফুরে হাওয়ায় ডেক-এ দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখতে কী ভাল যে লাগছিল! ফেরিঘাটে নেমে, প্রায় বাবুঘাটের ভিড় টপকে, সোজা চলে গেলাম অপেরা হাউসের সামনে। আহা! কী চোখ-জুড়নো স্থাপত্য! যেন সমুদ্রের ধারে পাপড়ি মেলছে এক পদ্মফুল! আমাদের সে দিনের সঙ্গী মালা ঘোষের সৌজন্যে চড়া হয়ে গেল সরকারি বাসেও। মার্সিডিজ কোম্পানির তৈরি বাস। ইস! আমাদের দেশে যে কবে ওই সব বাহারি বাস আসবে! শহরে যথেষ্ট বাস আর ট্রেন চলে সিডনিতে। পাতালরেল সিডনিতে চড়া হয়নি, মেলবোর্নেও না।

ট্রেনে চড়ার শুধু একটাই সুযোগ এসেছিল। হয়নি। ঝকঝকে আধুনিক ট্রেন নয়, সে ছিল আদ্যিকালের রেলগাড়ি। চলে ট্যুরিস্টদের আনন্দ দেওয়ার জন্য। কপাল খারাপ, সে দিনের মতো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সার্ভিস। ব্লু মাউন্টেনের আশেপাশেই নাকি ঘুরত ট্রেনটা। অবশ্য ব্লু মাউন্টেন আমরা তার আগেই দেখে এসেছি। সিডনি থেকে শ'খানেক মাইল দূরে নীল পাহাড়ের ধারে আমাদের নিয়ে গিয়েছিল সোমা আর দিব্যেন্দু। সোমার মা-ও ছিলেন সঙ্গে। মেয়ে আসন্নপ্রসবা বলে সিডনিতে এসেছেন তিনি, আর মেয়ের কখন কী হয়ে যায়, সেই ভয়ে ঠকঠক কাঁপছেন। তা, ডাকাবুকো মেয়ের সে হুঁশ থাকলে তো! নিজে গাড়ি চালিয়ে ব্লু মাউন্টেন যাবেই, থ্রি সিসটার্স নামের তিনখানা বাঁটকুল পাহাড় আমাদের দেখাবেই, কাটুম্বাতে কালামারি খাওয়াবেই। ফেরার পথে অবশ্য বউকে আর স্টিয়ারিং ধরতে দেয়নি দিব্যেন্দু। পর দিনই তো সোমা ভর্তি হল হাসপাতালে, জন্ম দিল মেয়ের। সোমার সাহস দেখে আমি থ।

এ ভাবেই ছুটে বেড়িয়ে হুস করে কখন ফুরিয়ে গেল সিডনির দিনগুলোও। সিডনির মধ্যমণি অঞ্চলটাকে তো দিনের বেলা চুটিয়ে দেখেইছি, রাতের সিডনিও দেখলাম সিডনি ছাড়ার আগের দিন। সে দিন গাড়ি চালাল শ্রীমন্ত, শর্মিলা আর শর্মিলার বর বাবলুবাবু আমাদের গাইড। আলোয় উদ্ভাসিত সিডনি অপেরা যেন নতুন করে দেখলাম রাতে, দেখলাম আলো-ঝলমল হারবার ব্রিজ, উলুমুলু পোর্ট। শুনলাম লেডি ম্যাকনির গল্প। মহিলার স্বামী নাকি সমুদ্রে যেতেন, আর স্বামীর জাহাজ কবে ফিরবে, তার প্রতীক্ষায় চেয়ারের মতো দেখতে এক পাথরে বসে থাকতেন মহিলা। দিনের পর দিন। বেচারি!

তা, রাতের সিডনি দেখতে বেরিয়ে রেড লাইট এলাকাই বা বাকি থাকে কেন! রাতভোর জেগে থাকা ওই পাড়াটাও প্রদক্ষিণ করে এলাম বার দুয়েক। সুন্দরী সুন্দরী মেমসাহেব দাঁড়িয়ে আছে ফুটপাথে, বই পড়ার ছলে অপেক্ষায় আছে খদ্দেরের, দেখে কেমন ইংরেজি সিনেমার দৃশ্য বলে মনে হয়।

www.MurchOna.com

ব্যস, এর পরেই তো নতুন দেশ দেখা শেষ। কাকভোরে সিডনি এয়ারপোর্ট। রাস্তায় এক দীর্ঘ, অতি দীর্ঘ টানেল, যেন ফুরোতেই চায় না। ও-পারে বেরিয়ে দেখি আমরা বিমানবন্দরের প্রায় দোর গোড়ায় পৌঁছে গেছি।

সিঙ্গাপুরগামী প্লেনে উঠে আবার টানেলটার কথা মনে পড়ল এক বার। শেষ মুহূর্তে ওই লম্বা সুড়ঙ্গটার বোধহয় খুব প্রয়োজন ছিল। ও-পারে রয়ে গেল সিডনি, মেলবোর্ন, ক্যানবেরা, স্নোয়িং মাউন্টেন...। তাদের ছবি মনে এঁকে এ-পার থেকে ফিরছি আমি। ফিরছি।

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com